# পঁচিশ বছরের বাংলা কবিতা

চিত্রা দেব

## কথামুখ

আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে 'আধুনিক' শব্দটি যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করার মতো ঐতিহাসিক দূরত্বে আমরা উপনীত। বছর পঞ্চাশের ব্যবধানে সব কিছুরই পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব, আধুনিক কাব্য আন্দোলনকেও মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে পুনর্বিচারের সময় এসেছে। এখন নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে, 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু কবিতার ক্ষেত্রে নয়, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা সঞ্চারে 'কল্লোল' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে দীর্ঘদিন শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে আসছে। কিছু অস্পষ্ট রহস্য এবং কৌতূহল নিয়ে 'কল্লোলের' আয়ুষ্কাল এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এই 'কল্লোল' পত্রিকাকেই আধুনিক কাব্য আন্দোলনের জন্মদাতা বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে সুধীজনের মতান্তর আছে। কিন্তু কল্লোলের দুঃসাহসিক আবির্ভাবই যে বাংলা সাহিত্য জগতে আধুনিকতাকে ত্বরান্বিত সুপ্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। যৌবনের সজীবতা ও অমিত প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে আধুনিক কবিরা দুরন্ত আবেগে দুর্মর বেগে 'কল্লোলে'র পাখায় ভর করে কবিতায় বাধাহীন আকাশের বিদ্রোহের রক্তরাগ ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল উনিশ-শতকীয় শাশ্বত নিরুদ্বেগ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যার প্রতীক পুরুষরূপে আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথকে। উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধগুলি রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চেতনালব্ধ আনন্দময় ইতিবাদের সঙ্গে মিশে অপূর্ব পূর্ণতা লাভ করেছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভাঙনের পথে যে কবিরা আবির্ভূত হলেন তাঁরা প্রচলিত বিশ্বাস এবং পুরনো সংস্কারের প্রতিভূস্বরূপ রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নতুন জন্ম ঘোষণা করলেন। তাঁদের এই বিদ্রোহই আধুনিক কাব্য-আন্দোলন নামে পরিচিত। কল্লোলের প্রায় সমসাময়িক 'প্রগতি', 'উত্তরা'-র সঙ্গে এই আন্দোলনের ঘনিষ্ট যোগ থাকলেও কল্লোল ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সবচেয়ে অগ্রণী। সুতরাং তার প্রথম প্রকাশের তারিখটিকেই আধুনিক কাব্য আন্দোলনের জন্মমুহূর্ত রূপে গ্রহণ করে আমরা নিশ্চয় ভুল করিনি।

## আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা

প্রশ্ন এসে পড়ে, আধুনিক বাংলা কবিতার নিজস্ব সংজ্ঞা কি? কেন কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে 'আধুনিক' শব্দটি সর্বদা যুক্ত হয়? 'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক। আজ যা আধুনিক এক যুগ পরে তা নাও থাকতে পারে। শেলি, কীটস তাদের যুগে আধুনিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন আধুনিক ছিলেন বাংলাদেশে। প্রমথ চৌধুরীও তার সময়ে ছিলেন রীতিমতো আধুনিক। তাহলে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা হবে কাদের? যদিও আধুনিক কবিরা রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্যেই আধুনিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন, তবু আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্দেশের জন্যে রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারস্থ হওয়া যাক। তাঁর মতে ঃ 'নদী যেমন বাঁক নেয় সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়। সেই বাঁকটাকেও বলতে হবে মডরণ, বাংলায় বলা যাক আধুনিক। আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।' বুদ্ধদেব বসু 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের সময় (১৯৫৩) আধুনিক



কবিদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে লিখলেন ঃ 'এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন সুর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন।'

আবার জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলেন এভাবে ঃ 'আজকের যুগের কতকগুলো লক্ষণ একালের কবিতায় থাকে। দেশ কাল সন্ততি (আজ পর্যন্ত মানুষের ধারণায় তাদের যে রূপ আমরা পাই সেই রূপ) যে কোন যুগের প্রাণবন্ত বলে পরিগণিত হবার সুযোগ যে-কাব্যে লাভ করেছে সে কবিতা আধুনিক।'

কোন কোন সমালোচক কবিতা বা কাব্য-আন্দোলনের পূর্বে 'আধুনিক'-শব্দ ব্যবহারে আপত্তি জানিয়ে তার পরিবর্তে শুধু কবিতা বা 'খণ্ড খণ্ড সময়ের রচনা' কথাটি লিখতে চান। কিন্তু আধুনিককে অনেকেই বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন। সুধীন দত্তও আধুনিক কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: 'বর্তমান কবিদের অধিকাংশই সাম্প্রতিক, আধুনিক নন।' অতএব বোঝা যাচ্ছে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধা কবিদের অনেকেই 'আধুনিক' শব্দটিকে বিশিষ্ট অর্থে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় (১৯৪০) আবু সয়ীদ আইয়ুব সবচেয়ে সহজ এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"

সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে লেখা রবীন্দ্র-প্রভাবযুক্ত এবং নতুন ভাবনামুক্ত কবিতাকেই বলা হলো আধুনিক কবিতা— আর যে কাব্য আন্দোলনের মধ্যে আধুনিক কবিতা জন্মলাভ করলো তাকেও 'আধুনিক' অভিধায় ভূষিত করে কবিরা তার গায়ে চিরনবীনের ছাপ মেরে দিলেন।

## পটভূমি

আমাদের আলোচ্য বিষয়— আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা বাংলা কবিতা। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। যে পটভূমিতে আধুনিক কবিতা লেখার অবিকল্প প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সারা পৃথিবীতেই প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়া চলেছে। রাষ্ট্র সমাজ এবং তার অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায় মানুষের জীবনে কোন স্থিতি সম্ভব হচ্ছিল না। বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন আবিষ্কার মনস্তত্ত্ব-ব্যাখ্যা চিন্তার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তার ফলে মানুষের জীবনদর্শন ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্রাক্তন ধারণা ও বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে ভাঙন ধরেছিল। অবশ্য এই পরিবর্তন শুরু হয় য়ুরোপে, কয়েক বছরের মধ্যে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তার ঢেউ এসে বাঙালি কবিদের চিন্তার তটভূমে আছড়ে পড়েছিল। মহাযুদ্ধ না হলে হয়তো আমাদের দেশে এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটতে পরতো না। কারণ উনিশ শতক পর্যন্ত কবিদের জগৎ ছিল শান্ত নিরুদ্বেগ এবং স্নিগ্ধ লাবণ্যে শ্রীপূর্ণ। পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্বন্ধেও তাঁরা খুব সচেতন ছিলেন তা নয়, বরং রোম্যান্টিক স্বপ্নলোকে বাস করার মানসিকতা নিয়েই তাঁরা কাব্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রীয়-চেতনায় নিরবচ্ছিন্ন সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের পালায় কোনো বড়ো অভিঘাত দেখা দেয়নি। এমন কি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাময়িক উত্তেজনাতেও এই সুর কাটার কোন লক্ষণ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের মিলনে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যে সহিষ্ণু সমবায়িতা লক্ষিত হয় তারই প্রভাবে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতে এক ধরনের নান্দনিক সম্পূর্ণতা এসেছিল, পরিবেশ চেতনা বড়ো হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণাকে

ভেঙে চুরমার করে দিল। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে ঘোষণা করা হয়: 'এই যুদ্ধ যুদ্ধের মূল উৎপাটন করবে।' মহাযুদ্ধের উচ্চ আদর্শ সে সময় অনেককেই উৎসাহিত করেছিল। যুদ্ধোপে রুপার্ট ব্রুক লিখলেন যুদ্ধের কবিতা। ভারতবর্ষে স্বরাজের ভূয়ো আশ্বাসে মেতে উঠে মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংসার পূজারীও যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। ভুল করলেন রবীন্দ্রনাথও। পৃথিবীর যাবতীয় পাপ, স্বার্থপর হানাহানি, বিদ্বেষের বিষবাষ্প একটি বিরাট বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হবে এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি লিখলেন বলাকা-গীতাঞ্জলির বহু কবিতা, অচলায়তন এবং শান্তিনিকেতন-ভাষণমালার কিছু কিছু প্রবন্ধ। অবশ্য তাঁদের সকলের মোহভঙ্গ হতে বেশি দেরি হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রের অমানুষিক ধীভৎসতা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের লুব্ধ লালসা মানুষের চূর্ণিত সত্তায় জন্ম দিল হতাশা ও নৈরাশ্যের। একই সঙ্গে রুশ বিপ্লবের চরম সাফল্য আমাদের সনাতন বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত হানলে, ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের নৈতিক-চেতনার নানান পরিবর্তিত মূল্যায়ন সম্ভব হলো।

### পূর্বতন ধারার সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য

এই পটভূমিতে আধুনিক কবিরা আর পূর্বতন-ধারার অনুবর্তনে রাজি হলেন না। যে-বিশ্বাসের বেলাভূমি থেকে তাঁরা উৎক্ষিপ্ত হলেন সেই প্রত্যয়ের স্বর্গে বিশ্বযুদ্ধের ক্লেদাক্ত পঙ্কের মধ্য দিয়ে পৌঁছানো সম্ভব নয়, তাই বাধ্য হয়েই আধুনিক কবিদের নতুন পথ খুঁজতে হলো। বিশ্বযুদ্ধ যেমন ভারতবাসীকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন করেছিল, তেমনি তাকে বিশ্বমনস্ক করে তুলেছিল। ভারতবাসীর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে একই ধনতান্ত্রিক ফাঁসে সমস্ত পৃথিবী বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, মনন ও কর্মের দিক থেকে প্রতীচ্য-ভাবনার সঙ্গে দৈগান্তিক দূরত্ব সৃষ্টি করে কোন লাভ নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি-শিক্ষার প্রসার-মূল্যবোধের অবনতি-নীতি ও ধর্মে বিশ্বাসহীনতা প্রভৃতি পরিষেষ্টনীর চাপে উভয় চিন্তাধারায় সাযুজ্য স্থাপিত হলো। ইতিপূর্বেও যে বাঙালি কবিদের ওপর য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক কবিদের প্রভাব পড়েনি তা নয়, তবে সে প্রভাব নিতান্ত গৌণ। রবীন্দ্র-শেলী-কীটসের যে-প্রভাবই থাকুক তাঁদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে ছিল ভারতীয়তা। কিন্তু যুদ্ধোত্তর নবীন কবিদের রচনায় যে বিদেশী প্রভাব এলো সেটি হচ্ছে সামগ্রিক উপলব্ধি, চৈতন্য চিন্তা ও যন্ত্রণার সাদৃশ্যজাত একই বিশ্ববীক্ষার ফসল। জীবনদৃষ্টি, বিশ্ববোধ ও সাদৃশ্য ছিল বলেই, আধুনিক কবিদের সঙ্গে বিদেশী কবিদের নিবিড় চিন্তা-সামীপ্য দেখা দিল।

নবলব্ধ চেতনা নিয়ে আধুনিক কবিরা যখন কবিতা লিখতে শুরু করলেন তখন তাঁদের কবিতায় কয়েকটি নূতন লক্ষণ ফুটে উঠলো। যেমন— বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতিতে মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক-সভ্যতা, মননধর্মী বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ও অবচেতন মনের ক্রিয়াকে অতিরিক্ত প্রশ্রয়দান, রুশ বিপ্লবের প্রভাবজাত মার্কসবাদ, সনাতন নীতি-ধর্মে আস্থাহীনতা এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নতুন পথ সন্ধান। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি সমস্ত আধুনিক কবির রচনায় সাধারণ লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ এর মধ্যেই আধুনিক কবিদের চরিত্র-লক্ষণ নিহিত রয়েছে।

### রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও স্বরূপ

আধুনিক যুগে যাঁরা কবিতা লেখা আরম্ভ করেন তাঁরা দেখলেন কাব্যলোকে মধ্যগগনে রবীন্দ্রনাথ সগৌরবে বিরাজমান। তাঁর বিশ্বব্যাপী কবিখ্যাতি এবং নোবেল পুরস্কার লাভ পারিপার্শ্বিক



সকলকেই রবীন্দ্র-চেতন করে তুলেছিল। আধুনিক কবিরাও প্রথমদিকে রবীন্দ্রানুসৃতির কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু দুটি ঘটনা তাঁদের রবীন্দ্রানুসরণে বাধা দিল—

প্রথমত, রবীন্দ্রিক নন্দনতত্ত্ব এবং শুভবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে মনোমুগ্ধকর দেশ-কাল প্রতিবিম্বিত হয়েছে, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সুধীন্দ্রনাথ তাকে বললেন 'পরীর দেশ'।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক কবিদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েকজন কবির রবীন্দ্রানুসরণে বিফলতা তাঁদের সতর্ক করে দিল। তাঁরা বুঝলেন নূতন পথ না খুঁজলে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ যেমন অনিবার্য, তেমনি অসম্ভব। সুতরাং তাঁরা বেঁচে থাকার জন্যে বা টিকে থাকার তাগিদে বিদ্রোহ করলেন। এই আপাত-রবীন্দ্রবিরোধিতায় ব্যক্তিদ্রোহিতা ছিল না, ছিল রোম্যান্টিক প্রতিবেশ ছেদের আকুলতা।

### বিশশতকের রবীন্দ্রানুসারী কবিরা

আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পূর্বে অর্থাৎ বিশ-শতকের প্রথম কুড়ি বছরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, কালিদাস রায়, প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী-কবি বাংলা কবিতার আসরে উপস্থিত হন। প্রসঙ্গে-প্রকরণে এঁরা রবীন্দ্রালোকের অন্তর্বর্তী। এঁদের কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল রোম্যান্টিক স্বপ্নময়তা, সত্য-শিব-সুন্দরে অবিচলিত বিশ্বাস, পল্লীবাংলার অনাড়ম্বর অকৃত্রিম জীবনের প্রতি আকর্ষণ, প্রেমে নিষ্ঠা, সামাজিক নিয়মগুলির প্রতি গভীর আস্থা, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য ইত্যাদি। কিন্তু এই রবীন্দ্রানুগত কবিরা বুঝতে পারেননি, 'গুরুদেবের কাব্যকলা মায়াস্বরূপে প্রতারক, সেই মোহিনীমায়ার প্রকৃতি না বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।' রবীন্দ্রানুসারী কবিরা ডুবলেনও তাই, তবে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে পরবর্তীদের সতর্ক করে গেলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ আঙ্গিক ও ছন্দের জন্য কিছুটা স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন। বুদ্ধদেব জীবনানন্দ প্রভৃতি দু-একজন আধুনিক কবি প্রথম জীবনে সত্যেন্দ্র দত্তীয় কাব্য-ঝংকারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রীয় কবিতায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব তাঁদের হতাশ করে।

### রবীন্দ্র-বিরোধীরা

রবীন্দ্রোত্তর-কবিদের মধ্যে তিনজন রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন। এঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুল ইসলাম। বিশেষ কোন ইতিহাস সৃষ্টিতে সক্ষম না হলেও, এঁরা শুধু দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য-পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। সেজন্য অনেকে মনে করেন আধুনিক কবিরা এঁদের রচনাপাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত পথ-সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কথাটি আংশিকভাবে সত্য। মোহিতলালের ভোগবাদ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং নজরুলের বাঁধনভাঙা যৌবনোল্লাস আধুনিক কবিদের মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল।

### মোহিতলাল

মোহিতলাল অতি সচেতনভাবে তান্ত্রিকসুলভ জীবনদর্শন নিয়ে দেহবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সাড়ম্বর ঘোষণা— "ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা" তদানীন্তন যুবমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অপরদিকে যতীন সেনগুপ্ত আধুনিক কবিদের অভিনিবেশ দাবি

করলেন দৈনন্দিন জীবনের রুক্ষতাকে কাব্যের বিষয় করে। প্রত্যক্ষের লবণাক্ত হাওয়ার স্পর্শের জন্য তিনি আন্তরিক আকুলতা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু হতাশা ও নৈরাশ্যের গ্লানি থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁর দুঃখবাদী মনোভাব এবং জীবনকে দেখার নেতিমূলক ভঙ্গিটি যুদ্ধোত্তর জীবনের সঙ্গে বড়ো বেশি খাপ খেয়ে যায়।

### নজরুল

ঈষৎ-পরবর্তী হলেও নজরুলের প্রভাব ভিন্ন ধরনের। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁর কবিতায় যে পরিমাণ উত্তেজনা ছিল সে পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিল না, তবু তিনি নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগাতে পেরেছিলেন। প্রাণশক্তির অসংবৃত আবেগে তিনি যে কোলাহল করলেন তার প্রথম অভিঘাতের উচ্ছ্বাসে দেশব্যাপী উন্মাদনা সৃষ্টি হলো।

## রবীন্দ্রবিরোধী কিন্তু আধুনিক নয়

রবীন্দ্র-প্রতিবোধের সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল কিন্তু আধুনিক কবি-পদবাচ্য হলেন না। তাঁরা রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মতো ঔপকরণিক চিরন্তনত্বে বিশ্বাস করেননি। বরং, আত্ম-সংবিতের আলোয় নতুন পথ দেখতে চেয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের সীমিত শক্তি। রবীন্দ্র-বিরোধিতা এবং রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের ওপর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন সাধনার ব্যাপার। উক্ত তিনজন কবির সে সাধনা ছিল না, তাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্যেই সব শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। তাতে বৈশিষ্ট্য ছিল নব নব রূপ-নির্মিতির, চোখ-ভোলানো মন-রাঙানো আয়োজন চোখে পড়েনি। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক, উদাহরণটির জন্যে আমরা বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। কবিদের মনে মৃত্যু-সম্পর্কিত ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মৃত্যু— 'শ্যাম সমান' এবং 'পরাণ বঁধু'। মোহিতলাল তাই বিরুদ্ধ-ভাবনার কথা লিখলেন—

কবির কাব্যে 'বধূ' বলে তারে ডাকা,
ধর্মের নামে পরিচয় করে থাকা
সে কথা বলি না দেখেছ কি কভু তারে,
বাহির দুয়ারে সম্মুখে একেবারে?

এরপর তিনি মৃত্যুর রূপ আঁকলেন ঃ

রক্তনয়ন বিকট বদন হাসিতে রক্ত ঝরে
নিঃশ্বাসে বাক হরে!

রবীন্দ্র-ভাবের বৈপরীত্য সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু মৃত্যুর ভয়াবহতা কাব্যরূপ পেল না। মৃত্যুর নূতন এবং সার্থক রূপের জন্য অপেক্ষা করতে হয় জীবনানন্দের জন্যে। যিনি লিখলেন ঃ

কুড়ির মতন সাদা মুখ তার
দুইখানা হাত তার হিম,
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে ঃ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়!

নব নব রূপনির্মিতিতে ব্যর্থতা ছাড়াও মোহিতলাল একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। তিনি রাবীন্দ্রিক কাব্যভাষাতেই ক্লাসিক দার্ঢ্য অয়োপ করে অ-রোম্যান্টিক হতে চেয়েছেন



এবং আঙ্গিকেও বৈচিত্র্য সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন, বলা বাহুল্য সফল হননি। কবিতায় গদ্যধর্মী-ভঙ্গী আনার জন্যে যে স্বতন্ত্র ভাষার প্রয়োজন, সে কথা বুঝতে পেরে সুধীন্দ্র দত্ত নবসৃষ্টি মোহিতলালের আধুনিক কবিদের ভালো লাগেনি, কিন্তু বাংলা কবিতার দিক পরিবর্তনের প্রয়োজন ও তাৎপর্য তিনিই সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করেছিলেন। সর্ব-কনিষ্ঠ নজরুলের সচেতন-শিল্পিতা ছিল না। তবু তাঁর জীবনের ভিন্ন পটভূমিকা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা কবিতার ক্ষেত্রে এনে দিল অনিবার্য মুক্তির স্বাদ। নজরুল নিজেও বুঝতে পারেননি তিনি নবযুগ নিয়ে আসছেন। কারণ তার মনে অতৃপ্তি ছিল না, তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ পরবর্তীদের মধ্যে সাহিত্যিক অংশীদার হতে চাইলেন। জীবনদর্শনে সাদৃশ্য থাকায় ভাবের ক্ষেত্রে আর বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রইল না। রবীন্দ্র-ক্ষেত্রের দুর্নিবার আগ্রাসী আলিঙ্গনকে এড়িয়ে যাবার এটাই ছিল একমাত্র প্রকাশ্য উপায়।

## রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হওয়ার পথে নানা বাধা

রবীন্দ্র-প্রভাব অগ্রাহ্য করতে গিয়ে বাঙালি কবিরা যে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার তুলনায় আধুনিক য়ুরোপীয় কবিদের সমস্যা অনেক কম ছিল। এলিয়ট-পাউণ্ড, প্রমুখ কবিকে শুধু রোমান্টিক কাব্য-সংস্কারকে ভাঙতে হয়েছিল। রোম্যান্টিক যুগের কোন কবি দৈহিকভাবে তাঁদের সামনে ছিলেন না, কিন্তু আধুনিক বাঙালি কবিদের সমস্যা আরো কঠিন হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। অপর দিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কাব্য-বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে নিজের কবিতা সম্বন্ধে নূতন করে চিন্তা শুরু করেছিলেন। ভঙ্গি-সর্বস্ব আধুনিকতাব নিত্য-মূল্য সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেও তিনি আধুনিকতাকে বর্জন করতে পারলেন না। পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যের আঙ্গিকে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দিল। ছন্দকে মুক্তি দিয়ে কাব্যের ভাষাকে কথ্যভাষাব কাছাকাছি নিয়ে এসে তিনি রচনা করলেন 'পুনশ্চ'। আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পুরোভাগে স্থাপন করে অন্যতম সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব ভূমিকায় লিখেছিলেন: "রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে তাকে আশাতীত মর্যাদা দান করলেন। গদ্যরীতির প্রচলন করে, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন করে, কবিকুল পরিত্যক্ত অসুন্দর, প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশকে গ্রহণ করে তিনি নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙেছেন।"

অপর সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথের বিবৃতিও অনুরূপ: "তিনি শুধু জ্যেষ্ঠ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ। তাই বিনয়-রহিত কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। স্বসৃষ্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহসীরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, তাদেরই দলে যোগ দিতে সংকোচ করেননি।"

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যাঙ্গিক পরিবর্তনকে 'আধুনিক'-সম্প্রদায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর নূতনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন তাকে স্বীকার করেও বলতে হবে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা তাঁর নিজস্ব কীর্তি। 'আধুনিক' বলতে তিনি কাল নয়, বিশেষ 'মর্জি'কে বোঝাতে চেয়েছেন। শেষ পর্যায়ে নূতন আঙ্গিকে কাব্য রচনা করলেও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শাশ্বত মূল্যবোধ থেকে কোনদিন বিচ্যুত হননি কিংবা প্রেমের চিরন্তনত্বে আস্থা—রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি—মানুষের প্রতি বিশ্বাস— কোনোটিই ত্যাগ করেননি। তাঁর অভিজাত শুদ্ধতাবোধ খণ্ড সত্য ও পরম সত্যের দ্বান্দ্বিক যন্ত্রণা পার হয়ে যে বৃহত্তর জগতে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল, আধুনিক যুগের জ্বালা-যন্ত্রণা-নৈরাশ্য

সেখানে পৌঁছাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনাদর্শই তাঁকে ভিন্ন জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবক্ষয় যুগের আধুনিক কবির পক্ষে সেখানে পৌঁছানো কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই 'পুনশ্চ' প্রকাশে আধুনিক কবিরা উৎসাহিত হলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনবোধের সাদৃশ্যে তাঁরা য়ুরোপীয় কবিদের যন্ত্রণায় অংশভাক্ হতে পেরেছেন অনেক বেশি।

## য়ুরোপীয় কবিদের প্রভাব

যাঁদের প্রভাব আধুনিক কবিদের রচনায় খুব বেশি দেখা গেল তাঁদের মধ্যে টি. এস. এলিয়টের নাম সর্বাগ্রগণ্য। আধুনিক কবিদের কাছে তিনি কাব্যের মুক্তিদাতা, মহাকবি। এলিয়টের মধ্যে তাঁরা পেলেন আত্মসচেতনতা, নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ, ইতিহাসচেতনা এবং বিশ শতকের অবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থার অপূর্ব কাব্য-রূপায়ন। পাউণ্ড ও হিউমের ইমেজিস্ট আন্দোলনে এলিয়টও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বেশ কয়েক বছর আগেই ১৯১০ ও ১৯১১ সালে লেখা দুটি কবিতা "The Portrait of a Lady" এবং "The Love Song of J.Alfred Prufrock" বিশ শতকের সাহিত্য জগতে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এলিয়ট আধুনিক যন্ত্র-যুগকে নিরাসক্ত ভাবে দেখে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আধুনিক মানুষের ট্রাজেডি বর্ণনা করলেন। ১৯২২ সালে মহাযুদ্ধের সার্বিক ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করার পর তিনি লিখলেন "The Waste Land"। একের পর এক তিনি রচনা করলেন আধুনিক মানবের জীবনভাষ্য। চূর্ণ-বিচূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে নতুন বিশ্বাসের সঞ্জীবনী ধারায় পূর্ণতর মানবে পুনরুজ্জীবিত করার আশা নিয়েই Waste Land- এ প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি লক্ষে পৌঁছলেন "Ariel Poems" ও "Ash Wednesday" পার হয়ে "Four Quartret" এ (১৯৩৬) এসে। এলিয়ট চেয়েছিলেন সুবিস্তৃত সংকটচেতনা পার হয়ে তাঁর কালের সার্বিক আত্মসংবিতের গহন ভাষাকে মুক্তি দিতে। নৈরাশ্য-সংশয়ের দুর্বলতা জয় করে অধ্যাত্ম উপলব্ধির শান্ত মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন নিত্য-পরিবর্তনশীল বৈপরীত্যের আশ্চর্য সঙ্গতি। মানুষের চৈতন্যের খণ্ডতার যন্ত্রণাকে তিনি চিরাচরিত পাপ-পুণ্যের জালে জড়িয়ে ঈশ্বরের অখণ্ডতার দুরূহ-সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এলিয়টের এই পরিবর্তন তাঁর অনুগামীদের অবশ্য পছন্দ হয়নি। কিন্তু সে পরের কথা। আপাতত বাঙালি কবিরা অনিবার্যভাবে এলিয়টের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অবশ্য আধুনিক কাব্য আন্দোলনের গোড়াতে আমাদের দেশে এলিয়টের প্রভাব পড়েনি। বুদ্ধদেব বসুর মতে: "লরেন্সীয় উন্মাদনার অবসানে পাউণ্ড এবং এলিয়ট একই সঙ্গে বাংলাদেশে পৌঁছল। উনিশ-শো তিরিশের বছরগুলি ভরে এ দুজনের বই কলকাতায় হাতে হাতে ঘুরছে, নাম মুখে মুখে রটেছে... বাংলার তরুণ অনতি-তরুণ কবিদের কানে তখন নূতনের মন্ত্র এ দুজনেই জপাচ্ছেন।"

আধুনিক বাংলা কবিতায় ডি.এইচ.লরেন্স এবং পাউণ্ডের প্রভাবও কম নয়। প্রতীকীদের পূর্বসূরী বোদলেয়ার নবীন কবিমানসে কিছু ছাপ রেখে গিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে র‍্যাঁবো, রিল্‌কে, মালার্মে, ভালেরি, লাফর্গ, হেল্ডার্লিন, অডেন, লরকা, সি.ডে.লুইস. আরাগঁ, এলুয়ার, স্টীফেন স্পেণ্ডার, লুই ম্যাক্কনিস প্রমুখের নাম করা চলে। অভিনবত্ব সঞ্চারের জন্য কেউ কেউ ইয়েটস, হপকিন্স ও হুইটম্যানের পন্থানুসরণ করলেন। এঁদের কবিতার সঙ্গে আধুনিক কবিতার সাদৃশ্য সব সময়ই যে প্রভাবজাত, তা ভাবার কারণ নেই, চিন্তার সামীপ্য এবং প্রত্যয়ের গভীরতা অনেক সময় দুই দেশের কবিতাকে অন্বিত করেছে। রবীন্দ্র-প্রভাব-উত্তীর্ণকামী আধুনিক কবিরা এ সময় ইচ্ছিত এবং অনিচ্ছিতভাবে য়ুরোপীয় কবিদের অনুবর্তন করতে



বাধ্য হয়েছিলেন। স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের কবিতা আলোচনার সময় এ সত্য আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

## কবিদের মন ও মননের আধুনিকতা

আধুনিক কবিদের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন: "এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন।" এই উক্তিটিতেই আধুনিকতার চারিত্র্য লক্ষণ পরিস্ফুট। আধুনিক কবিতা সচেতন মনীষিতার ফল। কিন্তু যে অর্থে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক সে অর্থে জীবনানন্দ আধুনিক নন, আবার জীবনানন্দের আধুনিকতার সঙ্গে সুধীন্দ্র দত্তের আধুনিকতার প্রভেদ প্রচুর। বিষ্ণু দে আর অমিয় চক্রবর্তীকেই কি আধুনিক কবি বলে একাসনে বসানো যায়? তবু এঁদের কাব্যে এমন কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ছিল যে সকলকেই আধুনিক বলতে কোন বাধা হয়নি। এঁরা সকলেই জীবনানুভূতির রাজ্য বিস্তৃত করেছেন সেই সঙ্গে নতুন ছন্দ ও চিত্রকল্পের উদ্ভাবনে কবিতাঙ্গিকে এনেছেন বিস্ময়কর পরিবর্তন। তার চেয়েও বড় কথা জগৎকে এঁরা সকলেই দেখেছেন তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে। চিরন্তনের পরিবর্তে পলাতক ক্ষণকালের ভাবচ্ছায়াকে ধরে রাখার আন্তরিক প্রয়াসের জন্য এঁদের সকলেরই ছিল প্রগাঢ় সময়চেতনা। স্বকাল সচেতনতা অনিবার্যভাবে এঁদের কবিতার পটভূমিকে নিয়ে এসেছে নাগরিক পরিবেশে। নগর-জীবনের সমস্ত ভালোমন্দ, সভ্যতা-যান্ত্রিকতা আধুনিক কবিতায় উপস্থিত। গ্রামের রূপ বা ভিন্ন পরিবেশ যে একেবারেই আসেনি তা নয়, নগর-জীবনের অসহ পরিমণ্ডল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কবিরা পল্লীপ্রকৃতি, প্রার্থিত নীড়, মাঠের শস্য, বিদেশী স্টবেরি বন, গ্রামের মেলা, শৈশবের রূপকথা-মেলা-গ্রাম্য পরিবেশ, সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল, নদীর তীর প্রভৃতিকে গ্রহণ করেছেন। তবে এই মুক্তিপ্রয়াস নগর-জীবন থেকে সরে যাওয়া নয়, নগরকে স্বীকার করেই গ্রাম্যজীবনের স্বপ্ন দেখা মাত্র। আপাত-রূঢ় অভিজ্ঞতার জগৎকে সততার সঙ্গে রূপায়িত করতে করতে তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের ধ্যানের মধ্যে। সুতরাং নগরমনস্কতায়, জীবনবোধের গভীরতায়, আকাঙ্ক্ষার স্বর্গচ্যুত আত্মসচেতন কবিদের সকলেই মননের দিক থেকে আধুনিক জগতের অধিবাসী।

## আধুনিক কবিরা

আধুনিক কাব্য আন্দোলন যাঁদের কবিতার মধ্য দিয়ে সফল হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশেষ মনোযোগ দাবি করেন। এঁদের সঙ্গে আরো যে দুজনের নাম করা যায় তাঁরা হলেন অজিত দত্ত ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এঁদের অল্প পরবর্তী অথচ শক্তিমান কবির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। দ্বিতীয় দলের পুরোভাগে রয়েছেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। আরো অনেকে এ সময় কবিতা লিখে আধুনিক কবিতার শ্রী-সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট কালসীমায় তাঁদের প্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি হয়নি। সেসব ক্ষেত্রে স্ফুলিঙ্গ দেখেই বহ্নির শিখা অনুভব করতে হবে। আপাতত বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে আসা যাক।

## বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই তিনি কাব্যজগতে প্রবেশ করেন এবং কৈশোর-লালিত্যে পূর্ণ একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেই